প্রথম আলো

কলাম

মতামত

এসএসসিতে ছয় লাখ ফেল, তাদের কথা কি আমরা ভাববো না?

মুনির হাসান
প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও যুব...

প্রকাশ: ১১ জুলাই ২০২৫, ১৫: ১৭

পরীক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসে মোবাইল ফোনে ফলাফল দেখছেন। জিলা স্কুল চত্বর ,বগুড়া শহর, ১০ জুলাই। *ছবি: সোয়েল রানা*

‘তুমি কেরানির চেয়ে বড়, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, এই কথাটা

আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের স্কুলেও এ শিক্ষা নাই।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বের মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়াতে স্বাধীন দেশ ও টেরিটরির একটি তালিকা আছে। সংখ্যাটি ২৪০। এর মধ্যে ৭১টি (২৪০-এর প্রায় ৩০ শতাংশ) দেশ ও টেরিটরির জনসংখ্যা ছয় লাখের চেয়ে কম। ছয় লাখের তুলনা টেনে আনার কারণ একটাই। গতকাল (১০ জুলাই) দেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার এই পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যা ছয় লাখের সামান্য বেশি! এর মানে হলো এই জনবহুল দেশে এসএসসিতে অকৃতকার্য হয় যত ছেলেমেয়ে, বিশ্বের ৭১টি দেশে তত লোকই নেই! কী নিদারুণ অপচয়!

প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিন আমার বুকটা ভেঙে যায়। আমি জানি না পৃথিবীর আর কোথায়, কোনো পাবলিক পরীক্ষায় ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৩২ জন পাস করতে না পারাকে লোকে স্বাভাবিকভাবে নেয়। ভাবটা এমন, ৩ জনে ১ জনের তো ফেল করারই কথা!

কাল থেকে অনেকেই এই ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ 'অনুসন্ধান' করেছেন। আজ (১১ জুলাই) দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত বিশ্লেষণে এ জন্য তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমত, এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা গত পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবনে করোনা মহামারিসহ নানা কারণে বিদ্যালয়ে ক্লাস পেয়েছে কম। দ্বিতীয়ত, 'প্রশ্ন কঠিন' হওয়ায় এবার গণিতে পাসের হার কম। তৃতীয়ত, এবার উত্তরপত্র মূল্যায়নে অন্যান্য বছরের চেয়ে 'কড়াকড়ি' ছিল। ('তিন কারণে এসএসসির ফল খারাপ', দৈনিক প্রথম আলো, ১১ জুলাই ২০২৫)।

এটিকে নির্মোহ বিশ্লেষণ মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই বোঝা যাবে অকৃতকার্যতার পুরো বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে। তারা বিদ্যালয়ে যেতে পারেনি এটি কেবল অকৃতকার্যদের বেলায় কেন প্রযোজ্য হবে? যারা কৃতকার্য হয়েছে, জিপিএ-৫ নামের সোনার হরিণ পেয়েছে, তারাও তো যেতে পারেনি। মানে কৌশলে বলা হলো ওরা পারল, তুমি পারলে না!

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ তো সরাসরি শিক্ষার্থীদের দায়ী করা হয়েছে। গণিতের প্রশ্ন 'কঠিন' করা হয়েছে এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে কড়াকড়ি করা হয়েছে। এই দুই কারণের কোনোটির দায় আমাদের শিক্ষা প্রশাসন এড়াতে পারবে? বোঝাই তো যাচ্ছে যে বিদ্যালয়ে পড়ালেখাটা নামকাওয়াস্তে হচ্ছে। শিক্ষকেরা গণিত কিংবা অন্যান্য বিষয়ে পাঠদানে সফল হচ্ছেন না, শিক্ষা প্রশাসন সেটি তদারকও করতে পারছে না এবং দিন শেষে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর খড়্গহস্ত হচ্ছেন! এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

ব্রিটিশ আমলে মেকলে কেরানি বাড়ানোর যে শিক্ষাব্যবস্থা শুরু করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত সেই একই ব্যবস্থাই আমরা অব্যাহত রেখেছি। একুশ শতকের সিকি ভাগ পার হয়ে আসার পর 'সৃজনশীল মুখস্থ' পদ্ধতিতে আমরা প্রতি বছর লাখ লাখ ছেলেমেয়ের গায়ে 'অকৃতকার্যে'র মোহর লাগিয়ে দিচ্ছি। তাদের মধ্যে যারা আগামী বছর চেষ্টা করবে,

তাদের আবার সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে! আর যারা আর চেষ্টা করবে না, তারা বেঁচেবর্তে যাবে। যে পরীক্ষায় কই মাছকে ডাঙায় দৌড়াতে হয়, সে পরীক্ষা থেকে সে বেঁচে যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষতির কথা কে ভাববে?

মাধ্যমিক পর্যায়ে গণিত শিক্ষার হালহকিকতও উঠে এসেছে এই বিশ্লেষণে। কিন্তু গভীর কারণ খতিয়ে দেখছে কি? দেশের গণিত শিক্ষার বারোটা বাজান আশির দশকের স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ১৯৮৭ সালে তিনি বোর্ডগুলোকে বাধ্য করেন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক 'নৈর্বচনিক/উচ্চতর গণিত' বিষয়কে 'ঐচ্ছিক' বিষয় করতে।

আশির দশকে এমনিতেই গণিতে পারঙ্গম শিক্ষক ছিলেন কম। ফলে অনেক স্কুলেই বিজ্ঞান পড়ানো যেত না। কিন্তু ঐচ্ছিকতার কারণে 'বিজ্ঞান শিক্ষার' ভগ্ন প্রসার ঘটে। উচ্চতর গণিত ছাড়া এসএসসি-উত্তীর্ণদের জন্য এরপর গণিত ছাড়া এইচএসসি এবং তারপর তিন বছরের ডিগ্রি পরীক্ষায় বিএসসি ডিগ্রির সুযোগ তৈরি করা হয়। ফলে আমরা এমন 'বিএসসি গ্র্যাজুয়েট পেয়ে যাই, যিনি কিনা নবম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত মাত্র ১০০ নম্বরের সাধারণ গণিত পড়েছেন'।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন যেন মন খারাপ না হয়, তার জন্য দরকার শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার দিকে নজর দেওয়া। সে জন্য বিদেশি বিশেষজ্ঞের দরকার নেই। আমাদের শিক্ষা-গবেষকেরাই এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তাঁদের কথা শুনলেই কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে আমাদের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে 'বিএসসি' শিক্ষকদের একটি বড় অংশ হন এই ধারার, যাঁরা স্কুলে গণিত ও বিজ্ঞান পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন। ২০০৩-০৪ সালে আমাদের প্রয়াত শ্রদ্ধেয় গণিত শিক্ষক অধ্যাপক লুতফুজ্জামান স্যারের একটি জরিপে সারা দেশে ৪ হাজার ৫০০ শিক্ষকের মধ্যে ৩ হাজার ৬০০ জনকে পাওয়া যায় এই ধারার। এই শিক্ষকদের বড় একটা অংশই স্কুলে গণিত পড়ানোর জন্য তাই শরণাপন্ন হন নীলক্ষেতের 'সমাধান' বইয়ের।

গণিত অলিম্পিয়াড চালুর প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি এই সমাধান বইয়ের অনেক সমাধানই ভুল থাকে। যেহেতু একটা গাণিতিক সমস্যা তাঁরা কয়েকভাবে সমাধান করতে অক্ষম (নিজেদের গণিতের ভিত্তি দুর্বল বলে), তাঁরা চালু করেন 'শিক্ষকের নিয়মে অঙ্ক না করলে' শূন্য (০) দেওয়ার রেওয়াজ। এই কারণে আমাদের শিক্ষার্থীদের এক বড় অংশের মধ্যে 'গণিত শিক্ষক ভীতি'র জন্ম। দিন শেষে এটিকে এখন অনেকেই 'গণিত ভীতি' বলে চালিয়ে দিতে চান।

অন্যদিকে ১৯৯১ সালে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ‘ত্রাণকর্তা’ হিসেবে আবির্ভূত হয় কিছু দাতাগোষ্ঠী। তাদের শর্ত মানতে গিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ৬০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী এটি প্রমাণিত যে মেয়েরাই শিশুদের শিক্ষক হিসেবে যেকোনো বিচারে উন্নত। কিন্তু ঝামেলা হলো ১৯৯১ সালে পর্যাপ্তসংখ্যক ন্যূনতম ‘স্নাতক’ মহিলা পাওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় ন্যূনতম এসএসসি!

এই শিক্ষকদের পক্ষে শিশুদের জন্য যোগ্য শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার প্রায়োগিক এবং ডোমেইন নলেজ—দুটোরই ঘাটতি ছিল। দুই দফায় এটিকে এখন স্নাতক করা হয়েছে। তবে এসএসসি-উত্তীর্ণ শিক্ষকদের শেষজন সম্ভবত ২০৩৩ সালে অবসরে যাবেন।

২০০৪ সালে আমরা গণিত অলিম্পিয়াড শুরু করি। আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের দল বাছাইয়ের পাশাপাশি আমরা এ সুযোগটি গ্রহণ করি দেশের শিক্ষার্থীদের গণিত দক্ষতার সমস্যাগুলো বের করতে। এ জন্য শুরুর দিকে আমাদের প্রাথমিক প্রশ্নে আমরা দুটো বিশেষ সমস্যা দিতাম।

একটিতে বলা হতো, ‘দুই কোটি দুই’ সংখ্যাটিকে অঙ্কে প্রকাশ করার জন্য। অন্য একটি গুণ অঙ্কে কৌশলে শূন্য (০) দিয়ে গুণ করার ব্যাপারটা থাকত। এবং আমরা অবাক হয়ে দেখতে শুরু করলাম এই দুই প্রশ্নে অনেক প্রাথমিক শিক্ষার্থীই কাবু হয়ে যায়। আরও গভীরে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ সংখ্যাপাতন (স্বকীয় মান ও স্থানীয় মান) সম্পর্কে তেমন ধারণা রাখে না।

জ্যামিতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে টের পেলাম আমাদের শিক্ষাক্রম ‘পিথাগোরাসের সূত্র’ ইউক্লিডের পদ্ধতিতে প্রমাণ (সবচেয়ে কঠিন প্রমাণ) শেখানোর জন্য যতটা তৎপর, সেই তুলনায় পিথাগোরাসের সূত্রের প্রয়োগ শেখাতে তাদের আগ্রহ কম। এসব কারণে আমাদের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ ‘অঙ্ক’ মুখস্থ করতে শুরু করে। কাজেই তাদের যদি মুখস্থের বাইরে অঙ্ক করতে দেন, তাহলে তো তারা সেটা পারবে না। ওদের কী দোষ!

আর এভাবেই আমাদের সবচেয়ে বড় বোকামি হয়ে যাচ্ছে, আমরা আমাদের সব ছেলেমেয়েকেই সাধারণ শিক্ষা, কেরানি বানানোর শিক্ষায় আটকে রাখতে চাই। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের, যাদের অন্য অনেক কিছু করার সামর্থ্য আছে, তাদেরও রাত জেগে মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা মুখস্থ করতে হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাবের ফলে বিশ্বজুড়ে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে এখন জাতিগুলো মনোযোগী হয়েছে। বিস্তার ঘটছে এসব বিষয়ের বৈশ্বিক সনদের, যার মূল্যও বাড়ছে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী আমাদের তরুণ শেষ পর্যন্ত একটি চাকরির জন্য হাপিত্যেশ করতে থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বছর বছর আমরা লাখ লাখ ভগ্ন হৃদয়ের কান্না দেখব, নাকি এ থেকে উত্তরণের চেষ্টা করব? বিশ্বব্যাপী হাইস্কুলের পাবলিক পরীক্ষার নানা রকম তরিকা আছে। ব্রিটিশ কারিকুলামে বছরে তিনবার পরীক্ষা দিতে পারে। এবং বিষয় ভাগ করে দুই-তিনবারে পরীক্ষা দিতে পারে।

আমরা আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দুই বছরের পাঠক্রম একসঙ্গে ১১টি বিষয়ে ততোধিক পেপার পরীক্ষা দিতে বাধ্য করি। অথচ দেখেন, তাদের চেয়ে যারা বয়সে বড় এবং ম্যাচিউরড তাদের বেলায় নিয়মটা ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা প্রতি সেমিস্টারে সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে পড়ে। বেশির ভাগ তার চেয়ে কম পড়ে। এবং কোনো বিষয়ে 'অকৃতকার্য' হলে পরের সেমিস্টারে শুধু সে বিষয়টি 'পাস' করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সবাইকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করার সনাতনী প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসা। এ জন্য দ্রুত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা দরকার। তারপর শিক্ষাকে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষায় ভাগ করে যার যেদিকে আগ্রহ, সেদিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা এই মন খারাপ করা পরিসংখ্যান দেখে যেতেই হবে।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন যেন মন খারাপ না হয়, তার জন্য দরকার শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার দিকে নজর দেওয়া। সে জন্য বিদেশি বিশেষজ্ঞের দরকার নেই। আমাদের শিক্ষা-গবেষকেরাই এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তাঁদের কথা শুনলেই কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সৃজনশীল মুখস্থ পদ্ধতির এসএসসি অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের সাফল্য কামনা করি।
যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের অভিনন্দন।

- **মুনির হাসান** প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো